জন্ম ও মৃত্যু

(গল্পগ্রন্থ – জন্ম ও মৃত্যু)

জীবনের মাঝে মাঝে চমৎকার ব্যাপার ঘটে। ভেবে দেখবার ও উপভোগ করবার জিনিস হিসেবে সেগুলোর মূল্য বড় কম নয়। সম্প্রতি আমার অভিজ্ঞতার গণ্ডিরমধ্যেই এমনই একটা ঘটনা এসে পড়েছিল—ঠিক একটা ঘটনা না বলে বরং তাকেদুটো ঘটনার সমষ্টিই বলা যেতে পারে।

মধুপুরে একটা বাড়ি ভাড়া করবার দরকার ছিল—এক জায়গায় সন্ধান পেলাম— ভবানীপুরের এক ভদ্রলোকের বাড়ি আছে মধুপুরে এবং তিনি সেটা ভাড়া দেবেন। সকাল বেলা তাঁর ওখানে গেলাম, বেলা তখন দশটা। ভবানীপুরে ভদ্রলোক যে বাড়িতে থাকেন তা বেশ বড় বাড়ি। বাইরে সুসজ্জিত বৈঠকখানা কিন্তু তিনি তখন বৈঠকখানার পাশে একটা ছোট ঘরের তক্তাপোশের উপর বসে গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন।

ভদ্রলোক বৃদ্ধ, বয়সে পঁয়ষট্টির কাছাকাছি মনে হল। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর বয়সের সম্বন্ধে আমার মনে কোন কল্পনার স্থান রাখলেন না। বললেন—আসুন, আসুন, বড় ভালো দিনে এসেছেন। আজ আমার জন্মতিথি কি-না, তাই বাড়িতে একটু উৎসব গোছের আছে। তা বেশ, এসেছেন যখন আপনাকেও ছাড়ছিনে—ইত্যাদি।

কারুর জন্মতিথি উৎসবে যে ভাবে তাঁকে মিষ্টকথা বলবার কথা—ভদ্রলোককে আমি তা বললাম। কাজের কথাটা এই উৎসবের দিনে কি ভাবে পাড়া যায়?বা কতক্ষণ ধরে জন্মতিথিতে মঙ্গলেচ্ছা প্রকাশ-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলবার পরই বা কাজের কথা পাড়া সুষ্ঠু হবে—কিংবা আজকার দিনে বাড়ি-ভাড়ার দরদস্তররূপ ইতরজনোচিত কথাবার্তা বলা আদৌ শোভন হবে কি-না— ইত্যাদি মনে মনে তোলা-পাড়াকরছি এমন সময়ে একটি সুন্দরী তরুণী হাসিমুখে বড় একটা ফুলের তোড়া হাতে ঘরেঢুকলেন, পেছনে একটি যুবক।

গৃহকর্তা বলে উঠলেন—এই যে অরুণা, এসেছিস্ দিদি—ওঃ, পেছনে যে নির্মলকে গাঁটছড়া বেঁধে এনে হাজির করেছিস — ছেড়ে আসা যায় না বুঝি? বেশ বেশ, আমরা হয়ে গিয়েছি এখন বুড়োসুড়ো—

তরুণী ফুলের তোড়াটি বৃদ্ধের হাতে দিয়ে প্রণাম করে এবং হাসিমুখে বৃদ্ধের গালে দুটি ঠোনা মেরে ঘর থেকে বার হয়ে গেল, যুবকটিও গেল পেছনে পেছনে। বৃদ্ধবললেন—আমার নাতনী—আমার বড় ছেলের মেয়ে। আইএ পাস—ও বছর বিয়ে হয়েছে—স্বামী ইঞ্জিনিয়ার, বিলেত-ফেরত, কর্পোরেশনে ভালো চাকরি পেয়েছে।

কথা তখনও ভালো করে শেষ হয়নি, আর দুটি তরুণী ঘরে ঢুকল—এদের ঘাড়ের উপর এলোখোঁপা এলিয়ে পড়েছে—পরনে জামিয়ারের মতো ছোট কল্কার কাজ করা নীল শাড়ি ও ব্লাউজ, গলায় সরু মফ্চেন, পায়ে সোনালী জরির কাজ করা নাগরা। দুটিই অবিবাহিতা—একটি গৌরী, অপরটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। এরাও ফুলের তোড়াদিলে—গৌরী মেয়েটি ঝিনুকের কাজ করা একটি নস্যদানি বৃদ্ধের হাতে দিয়েবললে—বাবা পাঠিয়েছেন কুন্নুর থেকে—মা আসতে পারলেন না এখন—রাত্রেআবার থিয়েটারে যাবেন।

বৃদ্ধ বললেন—আজ দুজনে বুঝি স্কুল কলেজ কামাই করে বসে আছ? যা ও ঘরে যা, —হরিদাসকে বলে রাখ্ গাড়ির কথা। আমার এরপরে মনে থাকবে না।

তরুণী দুটি চলে যেতেই বৃদ্ধ বললেন—আমার মেজ মেয়ের মেয়ে—বাগবাজারে আমার মেজ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। গোরাচাঁদ মল্লিকের নাম শুনেছেন তো? ওই তাদেরই বাড়ি। বনেদী বংশ—গোরাচাঁদ মল্লিক ছিলেন আমার মেয়ের শ্বশুরের...এই যে ভূধর!এসো, এসো বাবা—বোসো।

এবার আরও গুরুতর ব্যাপার। যাঁকে সম্বোধন করা হল এবং যাঁর নাম ভূধর তাঁর বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। তিনি স্থূলকায় হলেও সঙ্গের মহিলাটির তুলনায় তিনিনিতান্ত কৃশ। এঁদের স্বামী-স্ত্রীর পেছনে চার পাশ ঘিরে ছ'সাতটি ছেলেমেয়ে। এদের বয়স দশ থেকে উনিশের মধ্যে—আর একটি কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে একটু পিছিয়েছিল—তার কোলে একটি শিশু কিন্তু এ পর্যন্ত যে কয়টি মেয়ে এখানে দেখলুম, তার মধ্যে এই মেয়েটিই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী।

বৃদ্ধ তার দিকে চেয়ে বললেন—এই মৃণাল, পিছিয়ে কেন—আয় আয়, খোকাকেদেখি, দে একবার ভাই আমার কোলে। নিশীথ এল না?

আমার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছে। ছোট ঘরে যে ফাঁকা জায়গাটুকু ছিল স্বামী-স্ত্রীতার অনেকটা অংশ জুড়ে দাঁড়িয়েছেন। বাকিটা জুড়েছে ছেলেমেয়ের দল—পেছনের মেয়েটির জন্যে তেমন জায়গা নেই, আমি সঙ্কুচিত অবস্থায় চেয়ার যতদূর সম্ভব পিছিয়েসরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। জড় পদার্থকে আর সঙ্কুচিত করাসম্ভব নয়। অথচ এই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলে যে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে এদের স্থানেরসঙ্কুলান করবো তাও অসম্ভব। এরা আমাকে সঙ্কোচের হাত থেকে শীঘ্রই অব্যাহতিদিলেন—এই জন্যে যে, পেছনে আর একদল এসে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে, এরাবেরুলে তারা ঢুকতে পারে না। এরা তো প্রত্যেকে এক-একটা তোড়া দিয়ে গেল— দুটি মেয়ে আবার দুটি বেলের গোড়ে বৃদ্ধের গলায় নিজেরা পরিয়ে দিলে—বৃদ্ধ কি একটা ঠাট্টাও করলেন। আমার তখন শোনবার মতো অবস্থা ছিল না। তারা ঘর থেকেবার হয়ে গেলে বৃদ্ধ বললেন—এই আমার বড় ছেলে তারক, আলিপুরে প্র্যাক্‌টিস্করে, বালিগঞ্জে বাড়ি করেছে, সেখানেই থাকে। পিছনের দলটির মধ্যে মহিলানেই— তিনটি ছোকরা, বয়সে ষোল থেকে একুশ, এরা এসে কিছু দিলে না, একজন অটোগ্রাফের খাতা বার করে বললে—জেঠামশায়, আমার খাতায় আজকের দিনে কিছুলিখে দিন। অটোগ্রাফের খাতা ফেরত দিতে না দিতে আর দুটি ছেলে, তাদের সঙ্গেবারো তেরো বছরের একটি বেণী-দোলানো মেয়ে।

তারপরে ব্যাপারটা গণনার বাইরে চলে গেল।

কত ছেলে-মেয়ে, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া যে ঘরটায় ঢুকতে বেরুতে লাগল, আমার আর তাদের হিসেব রাখা সম্ভব হল না। ফুলে ফুলে তক্তাপোশটা ছেয়ে গেল, ফুলের তোড়া ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠতে লাগল—আর সেখানে জায়গা দেওয়া যায় না। আর এরা সবাই আত্মীয়-আত্মীয়া, বাইরের লোক কেউ নেই। সব আপনা-আপনিরমধ্যে, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, জামাই, ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী—ইত্যাদি ইত্যাদি। ভদ্রলোক ভাগ্যবান, এঁদের মতো লোকের সাহায্য না পেলেপ্রজাপতির সৃষ্টি রক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠত। ক্রমশ ভিড় বাড়ছে দেখে আমি ঘর থেকেবেরিয়ে পড়লুম, আমি তখন বাড়ির বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। বাড়ির সামনের গলিতে সারিবন্দী মোটর দাঁড়ানো—সেখানে ধরেনি। গলি ছাপিয়ে মোটরের সারি বড় রাস্তায় এসেপৌঁছেচে, বিয়ে বাড়িতেও এত মোটর জমে কি-না সন্দেহ। গলি পারহয়েই বড় রাস্তার মোড়ে নিবারণ মিত্রের সঙ্গে দেখা—সে আমার পরিচিত বন্ধু, সেজেগুজে সিল্কের পাঞ্জাবি শুঁড়ওয়ালা নাগরা পরে তাকে ব্যস্তসমস্ত ভাবে গলিতে ঢুকতে উদ্যত দেখে বললুম, ওহে, তুমিও কি বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি যাচ্ছ নাকি?

—হ্যাঁ। কেন বল তো? তুমি বিশ্বনাথবাবুকে চিনলে কি করে?

—এতক্ষণ সেখানে বসেছিলুম ভাই, দেখে শুনে মাথা ঘুরে উঠল। শহরেরএক-তৃতীয়াংশ লোক দেখলুম বিশ্বনাথবাবুর আত্মীয়-আত্মীয়া, আর তাঁরা সবাইএসেছেন ওই সাতাত্তর বছরের বুড়োর জন্মদিনে ফুলের তোড়া উপহার দিতে। তোমার তোড়া কই?

বন্ধু হেসে বললে—খুব আশ্চর্য লাগছে? বিশ্বনাথবাবুর সাত ছেলে চার মেয়ে।এদের সকলেরই আবার ছেলেমেয়ে এবং অনেকেরই নাতি-নাতনী, নাতজামাই ইত্যাদিহয়ে গিয়েছে। বিশ্বনাথবাবুরা তিন ভাই। তাদের ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী আছে।হিসের করে দ্যাখো কত হয়—এবং আসল কথা কি জানো, বুড়োর হাতে হাজারপঞ্চাশ-ষাট টাকা আছে, সকলেরই চোখ সেদিকে একথা যদি বলি, তবে সেটা খুব খারাপ শোনাবে হয়তো। কিন্তু কথাটা মনে না উঠে কি পারে? তুমিই বলো?আচ্ছাআসি ভাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বনাথবাবুর জন্মদিনের সপ্তাহ দুই পরেই আমি স্বগ্রামে গেলুম। বলা আবশ্যক যে, আমার গ্রামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব বেশি নয়, সেখানে বছরে একবার যাওয়াও ঘটে কিনা সন্দেহ।

বাড়ি গিয়ে শুনলুম গ্রামের বৃদ্ধা শশী-ঠাকরুন মারা গিয়েছেন। শশী-ঠাকরুনেরবয়স যে কত হয়েছিল, তা বলা শক্ত। কেউ বলে নব্বই কেউ বলে একশ'র কাছাকাছিহবে। আমরা মোটের উপর তাঁকে আমাদের বাল্যকাল থেকেই অতি-বৃদ্ধাই দেখে আসছি। বয়সের যে গণ্ডি পার হয়ে গেলে মানুষের আকৃতির পরিবর্তন আর চেনবার উপায় থাকে না, শশী-ঠাকরুন আমাদের বাল্যেই সে গণ্ডি পার হয়েছিলেন।শশী-ঠাকরুনের চার ছেলে তিন মেয়ে। বড় ছেলেটি ছাড়া আর সকলেই বিদেশে চাকরিকরে—বড় ছেলে তেমন লেখাপড়া না জানার দরুন দেশে থেকে সামান্য কি কাজকর্ম করে, তার অবস্থাও ভাল নয়, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে বড় কষ্ট পায়। ভায়েরাপৃথক, কেউ কাউকে সাহায্য করে না। কর্মস্থান থেকে দেশেও কেউ আসে না।

শশী-ঠাকরুনের কষ্টের অবধি ছিল না। একটা চালা-ঘরে ইদানীং তিনি পড়েথাকতেন—বড় ছেলেই তাঁর ভরণ-পোষণ করতো বটে, কিন্তু তেমন আগ্রহ করেকরতো না। অর্থাৎ তার মনের মধ্যে এ ভাবটা জেগে রইলো যে, মা তো আমার একার নয়—সকলেরই তো কিছু কিছু সাহায্য করা উচিত মাকে—তারা যদি না করে আমিইবা কেন এত দায় ঘাড়ে করতে যাই?

শশী-ঠাকরুনের অন্য ছেলেরা কখনো সন্ধান নিত না—বুড়ি বাঁচল, কি মোলো।অথচ তাদের সকলেরই অবস্থা ভালো—মাইনে কেউই মন্দ পায় না, শহরে স্ত্রী-পুত্রনিয়ে থাকে। বড় ভাইয়ের পত্রের জবাব দিত—তাদের নিজেদেরই অচল হয়েছে, শহরের খরচ থেকে বাঁচিয়ে বাড়িতে কি করে পাঠায়। বাড়িতে বিষয়-সম্পত্তি তোরয়েছে—তার আয় থেকে তো মায়ের চলা উচিত— ইত্যাদি। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি এমনকিছুই না যার আয় থেকে বেকার বড় ছেলের একপাল পোষ্য ও শশী-ঠাকরুনেরভরণ-পোষণ ভালো ভাবে চলে।

বুড়ি খেতেই পেত না। ইদানীং আবার তার ছেলেমানুষের মতো লোভ দেখা দিয়েছিল—বিশেষ করে মিষ্টি জিনিস খাবার। আমি সেবার যখন দেশে যাই, বুড়ি দেখি একটা কঞ্চির লাঠি হাতে মুখুয্যে পাড়ার মোড়ে বেলতলায় বসে। আমায় দেখে বললে, কুঞ্জ এলি নাকি?

—হাঁ, ঠাক্‌মা। এখানে বসে কেন?

—এই বাদা বোষ্টম খাবার বেচতে যাবে, তাই বসে আছি তার জন্যে। বাতাসা কিনব—ভিজিয়ে খাই।

—তা বেশ, বসো। ভালো আছ তো?

—আমাদের আবার ভালো থাকা-থাকি, তুমিও যেমন দাদা। খেতেই পাইনে।বাদার কাছে চারটে পয়সা ধার হয়েছে, আর সে ধার দিতে চায় না। সিধুর কাছে আরকত চাইব। সে নিজের ছেলেপিলে নিয়ে আতান্তরে পড়ে আছে। আহা, বাছার আমারমুখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আমি তার কাছে কিছু নিই নে। তা তুই আমাকে আনাচারেক পয়সা দিয়ে যাবি?

বুড়ির অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হল। পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তার হাতেদিয়ে বললাম—এখন রাখুন ঠাক্‌মা, যখন যা দরকার হয়—আমি যতদিন বাড়ি থাকি, দিয়ে যাব আপনাকে।

বুড়ি অবাক্ হয়ে গেল—আনন্দে বিস্ময়ে সে যেন প্রথমটা বুঝতেই পারলে না—আমি কি তাকে সত্যি একটা গোটা টাকা দিলুম।

পরের বছর—পুজোর কিছু আগে দেশে গিয়েছি—বুড়ি দেখি আমাদের বাড়ির সামনের বাতাবি লেবুর তলার পথটা দিয়ে যাচ্ছে—হাতে একটা কাঁসার জামবাটি। আমায় দেখে বললে— কখন বাড়ি এলি?

বললুম—কাল এসেচি ঠাক্‌মা। বাটি হাতে কোথায় গিয়েছিলেন?

—আর বলিস্‌নে, দাদা! বাটিটা নাপিতবাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম যদি ওরা কেনে।আমার দিন তো আর চলে না, হাতে মোটে পয়সা নেই। সিধু খুলনে গিয়েছে—আজ চার-পাঁচদিন। বাড়ি একেবারে অচল। ছেলেপিলেগুলো খেতে পায় না এমন অবস্থা।

—তা বাটিটা বিক্রি করে আর ক'দিন যাবে ঠাক্‌মা?

—তবু যে ক'দিন যায়। তাও ওরা নিলে না—বলে এখন নগদ দিতে পারব না।ধারে বাটি দিলে আমার কি করে চলে ভাই বলো তো? একটু গুড় খেতে পাচ্ছিনে, বাটিটা বেচে ভেবেছিলাম আজ হাটে আধসের ভালো আকের গুড় আনতে দেব—আর আজকের হাটটাও হবে এখন। ছেলেপিলে শুধু ঝিঙে ভাজা আর ভাত খেয়ে মারা গেল। তা নিবি দাদা বাটিটা?—ফুল কাঁসা, এ ওদের বাটি না। আমার নিজের বাটি—বিয়ের দানে আমার বাবা দিয়েছিলেন, দ্যাখ্ না?

শহরে থাকি,—অনেক সময় কাঁচা পয়সা রোজগার করি। পাড়াগাঁয়ে যে এতপয়সার কষ্ট তা ভেবে দেখি নে। আমায় অন্যমনস্ক দেখে বুড়ি ভাবলে বোধ হয় বাটি কেনবার ইচ্ছে নেই আমার। অনেকটা মিনতির সুরে বললে—না কিনিস্, ওটা বাঁধারেখে আমায় বরং আট আনা পয়সা দে।

এ রকম অবস্থায় বুড়িকে আমি আরও কয়েকবার দেখেছি।

শুনলাম—বুড়ির মরণকালে ছেলেরা কেউ আসেনি—বড় ছেলে খুব সেবা-যত্ন করেছিল। বুড়ির গায়ে একটা লেপ ছিল, মরণের ঘণ্টা দুই আগে বুড়ি পুত্রবধূকে বলেছিল—বৌমা, লেপটা সরিয়ে নাও, চার-পাঁচ টাকা দামের লেপটা—আমি বাঁচব না, তখন ওটা আমার সঙ্গে ফেলে দিতে হবে। ও গেলে আর হবে না বৌমা। আহা, কোথায় পাবে সিধু যে আবার চার-পাঁচ টাকা খরচ করে লেপ বানাবে? শীতকালেবাছারা আমার আদুড় গায়ে কাটাবে তাহলে।

আরও খানিক পরে বুড়ি ছেলেকে ডেকে বললে—দ্যাখ্ সিধু, একটা কথা বলি, শোন্। আমার শ্রাদ্ধে বেশি কিছু খরচপত্র করতে যাসনে যেন। বিধু, মণি, শরৎ ওরা কেউ কিছু হয়তো দেবে না—তুই একা পাবি কোথায় যে খরচ করবি? নমো নমো করেঅমনি পাঁচটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে দিবি। আর যদি ওরা কেউ কিছু পাঠায়, তাও সব টাকা খরচ করিস নে। হাতে কিছু রাখবি, —এরপরে
তোর ছেলেপিলেরা খেয়ে বাঁচবে।

শুনলাম শশী-ঠাকরুনের ছেলেরা সবাই বাড়ি এসেছে ও খুব ঘটা করে মায়ের শ্রাদ্ধকরছে।

বেড়াতে বেড়াতে ওদের বাড়ির দিকে গেলাম। সামনের উঠানে নারিকেলের ডালপুঁতে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে—মণ্ডপের সামনে শামিয়ানাটাঙানো। গ্রামের অনেকেই সেখানে উপস্থিত, সেজ ছেলে গোপেশ্বর কাছা গলায়গ্রামের বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আফিসে নূতন লোক ঢোকানো আজকাল যে কতঅসম্ভব হয়েছে—সে সম্বন্ধে কি বলচে। গোপেশ্বরের বয়েস পঁয়তাল্লিশ ছাড়িয়েছে, রেলের অডিট অফিসে বড় চাকুরি করে—চৌধুরী মহাশয় বোধ হয় তাকে কারো চাকুরির জন্যে বলে থাকবেন, কথার ভাবে তাই মনে হল।

—আগে অনেক ঢুকিয়েছি কাকাবাবু, সিমসন গিয়ে পর্যন্ত আর সেই সুবিধে নেই।সিমসন সাহেব, আমি যা বলেছি তাই করেছে। এখন পোস্ট খালি হলে সব তলায়তলায় ঠিক হয়ে যায়—আপিসের আর সেদিন নেই। শুনলাম গোপেশ্বর রিটায়ার করারপরে প্রভিডেন্ট ফান্ডের দরুন প্রায় আঠার উনিশ হাজার টাকা পাবে, হাওড়ায় নাবরানগরে জমি কিনছে সেইখানেই বাড়ি করবে। আজ দশ-এগারো বছরের পরে সে দেশে এসেছে, মায়ের মৃত্যু না ঘটলে, আরও কতদিন আসতো না তাই বা কে জানে!

ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এদের বাড়িতে যে এত ছেলে-মেয়ে, বৌ, ঝি-চাকর আছে—তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবার জো ছিলনা। মেজ, সেজ ও ছোট ছেলের বৌয়েরা এসেছে, তাদের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনীতেবাড়ি ভর্তি। খুব ছোট বেলায় যে মেয়েদের দেখেছিলাম, হয়তো অনেকের সঙ্গে খেলাও করেছি—তাদের বিয়ে হয়ে ছেলেপিলে হয়ে গিয়েছে—অনেকের স্বামীরাও এসেছে। তবু তো বুড়ির বড় মেয়ে অনেক দূরে থাকে বলে আসতে পারেনি—অপর দুই মেয়েও তাদের ছেলেমেয়েরা এসেছে। সবাই ব্যস্তসমস্ত, এখানে তরকারি কোটা হচ্চে, ওখানে জিনিসের ফর্দ হচ্ছে, বাড়িময় ছেলেমেয়েদের

চীৎকার, হাসি, ছোটাছুটি—মেয়েরা এ ওকে ডাকছে, মায়েরা ছেলেপিলেদের বকছে, কুয়োতলায় বড় বড়পেতলের গামলা মাজার শব্দ, বাড়িসুদ্ধ সবাই শশব্যস্ত, কারো হাতে একদণ্ড সময়নেই।

—ওরে ও ঝি, রেণুর গায়ের জামাটা ছাড়িয়ে নিয়ে কেচে দে না বাপু, কতক্ষণ থেকে বলছি, আমার কি সব সময় সব কথা মনে থাকে?

—ও কমলা, হেলে দুলে বেড়াচ্ছ মা, ততক্ষণ পানগুলো তুমি আর বীণা নিয়ে ধুয়েফেল না—এরপর আর সময় পাবে?...কি-কি—আবার মরছে ডেকে ছোট বৌ—মাগো, হাড় জ্বালালে—বস্তে দেয় না একরত্তি—এই তো আসছি ভাঁড়ার ঘর থেকে—

একটি সতেরো-আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়ে দালানে ঢুকবার দরজার এক পাশে একটা স্টোভ ধরাবার চেষ্টা করছে—আমি পাশ কাটিয়ে দালানের মধ্যে ঢুকে দেখি— মেজ ছেলে বীরেশ্বর ও তার বৌয়ে ঝগড়া হচ্ছে। মেজ ছেলে কোন্ জমিদারী স্টেটের ম্যানেজার, বয়েস পঞ্চাশের ওপর—তার স্ত্রীকে আগে কৃশাঙ্গী দেখেছি, আজ আট ন' বছর দেখিনি—এত মোটা হয়েছেন যে এরই মধ্যে প্রথমটা যেন চিনতেই পারি না।হাতে মোটা সোনার বালা ও অনন্ত, গলায় ছিকলি হার। তিনি স্বামীকে বলছেন—ও ঘরে আমি থাকতে পারব না, এই ভিড়, তাতে ও ঘরে খিল নেই। আমার মেয়ের গায়েএক-গা গয়না, কাজের বাড়ি, লোকের ভিড়—বিশ্বাস আছে কাউকে—তাতে এইপাড়াগাঁ জায়গা? বাবা, ভালোয় ভালোয় কাজ মিটিয়ে এখন এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। কাল সারারাত মশায় খেয়েছে।

বীরেশ্বর বলছে, তা তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে না হয় পশ্চিমের কোঠায় শুয়ো—মাথা গরম কোরো না, দোহাই তোমার— তোমার মাথা গরম আমার বরদাস্ত হয় নাবাপু—

আমি ঢুকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বললুম—চিনতে পারেন কাকীমা?

তিনি কথার উত্তর দেবার পূর্বেই এগারো বারো বছরের একটি মেয়ে কোথা থেকেছুটে এসে বললে—নাথ্নি এখনও পিন্টুকে দুধ খাওয়ায়নি মা—সকাল থেকে তাকেনিয়ে বাইরের উঠোনে বসে আছে—বললেও শুনচে না—

বীরেশ্বর বললে—যা এখন যা, বলগে যা নাথ্নিকে—আমি ডাকছি। এসো কুঞ্জবসো। ওগো তুমি কুঞ্জকে চিনতে পারলে না?

বীরেশ্বরের স্ত্রী মৃদু হাস্যে বললে—দেখেছি বোধ হয় ওকে ছেলেবেলায়, যাতায়াতনেই—দেখাশুনো তো হয় না, না-চিনবার আর দোষ কি বল? শাশুড়ি মারা না গেলেকি এখন আসা হত? চিঠি পেয়ে আমি বলি—না যেতে হবে বই কি, দেশে একটা মানখাতির আছে। শাশুড়ির কাজটা ভালো করে না করলে লোকে ওঁদেরই দুষবে।বট্‌ঠাকুরের পয়সা নেই সবাই জানে। ওঁদের গাঁয়ে-ঘরে নাম রয়েছে, দেশে-বিদেশেসবাই মানে, চেনে, বলবে—অমুক বাবুর মায়ের শ্রাদ্ধে কিছুই করেনি, বল তো বাবা, কথাটা কি শুনতে ভালো? ...তাই তো এলুম, নইলে এসব জায়গায় কি মানুষ আসে? কি মশা! কাল রাত্তিরে একদণ্ড চক্ষের পাতা বুজতে দেয়নি।

রোয়াকের ধারে বসে মেজ ভাইয়ের ছেলে বিকাশ তাদের স্কুল কিভাবে একটাফুটবল-ম্যাচ্ জিতেছে, মহা-উৎসাহে সে গল্প করছে সেজ ভাইয়ের ছেলে বিনুর কাছে।বড় ভাইয়ের ছেলে ভোলা অবাক্ দৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে চেয়ে এক মনে গল্প শুনছে। তার বয়েস ওদের চেয়ে যদিও বেশি, কিন্তু জীবনে কখনো সে গাঁয়ের আপারপ্রাইমারী পাঠশালা ছাড়া অন্য স্কুলের মুখ দেখেনি। এদের কাছে সে সর্বদা কুণ্ঠিত হয়েআছে। শুধু ভোলা নয়—ভোলার মাকেও লক্ষ্য করলুম,—জায়েদের বড়মানুষিচালচলন ও কথাবার্তার মধ্যে নিতান্ত সঙ্কুচিত হয়ে আছে। জায়েরা বড়মানুষি দেখাবারজন্যে প্রত্যেকে ঝি-চাকর এনেছে, তাদের কাছেও যেন ও-বেচারী কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত।

হঠাৎ কোথা থেকে বিকাশের ছোট দিদি আরতি ঝড়ের মতো এসে বললে—এই যে এখানে বসে গল্প হচ্ছে ছেলের। ওদিকে কাকীমা, দিদি—সব ডেকে ডেকে হয়রান, চা হয়ে গেছে, খেয়ে এসে সবার মাথা কেনো, যাও—

ওকে দেখেই আমার একটা ছবি মনে এসে গেল। বৃদ্ধা, মাজা-বাঁকা গাল-তোবড়ানো শশী-ঠাকরুন কাঁসার বাটি বিক্রয় করতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরছে নাপিত-বাড়ি থেকে। এই হাসিমুখ বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, তরুণী—এদের সৌন্দর্য, সজীবতা, আনন্দ, যৌবন—এদের সৃষ্টি করেছে সেই দরিদ্রা বৃদ্ধা শশী-ঠাকরুন—এরা তারই বংশধর—তারই পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, আজ তার মৃত্যু-বাসরে এই যে চাঁদের হাট বসেছে—এতদিন এরা ছিল কোথায়? এরা থাকতে বুড়ি কেন খেতে পেত না, কেন চোখের জলে তার বুক ভেসেছে—তার কোন উত্তর নাই।

সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সেই বাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়ির উৎসবের কথাওমনে পড়ে গেল। এইরকমই অগণিত পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্রী, দৌহিত্রের ভিড় দেখেছিসেখানেও। সবই সেইরকম—কেবল সেটা ছিল জন্মতিথি উৎসব—জন্মতিথি যার, তার বয়েস শশী-ঠাকরুনের মতোই প্রায়।